সাম্যবাদ

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’–এর মুখপত্র

১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে ২০২৫ | web: www.spbm.org | মূল্য ২ টাকা

ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবনা ও সংস্কার প্রসঙ্গে

অন্তবর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর প্রস্তাবনা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা ও জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ঐকমত্য কমিশনের প্রথম সভায় ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’-এর পক্ষ থেকে ৬টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চারটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া পেশ করা হয়। তখন আমরা বলেছিলাম যে, এটা আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। পরবর্তীতে অন্যান্য কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে ও এই চারটিরও খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরব। পরবর্তীতে পুলিশ সংস্কার কমিশন বাদ দিয়ে বাকি পাঁচটি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে স্প্রেডশিট তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোকে পাঠানো হয়।

সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে এদেশের ইতিহাসসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলোর উত্তর স্প্রেডশিটে টিকচিহ্নের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব নয়। ফলে মতামত গ্রহণের এই পদ্ধতিটি সঠিক নয় বলে মত প্রকাশ করে ঐকমত্য কমিশন বরাবর ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে একটি চিঠি দেই। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সংবিধান ও নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের উপর আমাদের লিখিত মতামত এবং বিচারবিভাগ, জনপ্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের রিপোর্টের উপর স্প্রেডশিটে মতামত আমরা ঐকমত্য কমিশনে জমা দেই। আমাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩ মে, ২০২৫ তারিখে ঐকমত্য কমিশন আমাদেরকে আলোচনায় আহবান করে। সেখানে আমাদের সাথে ঐকমত্য কমিশনের বহু বিষয়ে আলোচনা হয়। সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্টের উপর প্রেরিত লিখিত বক্তব্যটি আমরা তুলে ধরলাম। পরবর্তীতে অন্যান্য কমিশনের উপর রাখা আমাদের মতামত আমরা তুলে ধরব।

সংবিধান ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে লিখিত মতামত (২৩ মার্চ, ২০২৫)

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা সম্পর্কে

(সংবিধান সংস্কার কমিশনের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ‘কমিশন’ ব্যবহার করা হবে)

নাগরিকতন্ত্র

• আমরা সংবিধানের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে উক্ত রাষ্ট্রের পূর্ব নামই বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। কমিশন সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণে ‘Republic’ ও ‘People's Republic of Bangladesh’ শব্দগুলো বহাল রাখার কথা বলেছেন, অর্থাৎ দেশের নাম মূলত: পরিবর্তন হচ্ছে না। যেটা পরিবর্তন করার সুপারিশ করেছেন সেটা হলো এর বাংলা নাম অর্থাৎ ‘প্রজাতন্ত্র’ ও ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ এর পরিবর্তন করে ‘নাগরিকতন্ত্র’ ও ‘জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ’ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন।

‘জনগণতন্ত্র’ শব্দের ইংরেজি ‘People’s democracy’. এটি বাংলা ও ইংরেজি রাজনৈতিক পুস্তকে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অন্তবর্তীকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বোঝায়।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর People’s democratic republic হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছিল। এই সকল দেশকে বাংলা ভাষায় জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দলিলে এর উল্লেখ আছে।

গত ৩ মে ২০২৫ তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে বাসদ (মার্কসবাদী)-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

কমিশন বলছেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক চরিত্র ও শাসকদের জমিদারসুলভ আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে ‘প্রজাতন্ত্র’ শব্দটির মধ্যে। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে যে সকল শাসক শাসনক্ষমতায় এসেছেন, তারা জমিদারসুলভ নয়, একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকরা যে আচরণ করে থাকে, তাই করেছেন। বুর্জোয়ারা প্রথম যুগে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তাকেই প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়।

যেহেতু বাংলা অনুবাদটি People's Republic না বুঝিয়ে অন্য একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা বোঝায় এবং সেটি বহুল ব্যবহৃত ও প্রতিষ্ঠিত, ফলে আমরা পূর্বের নাম রাখাই ঠিক মনে করি। তা না হলে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। প্রজা শব্দটি নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকলেও এটি প্রচলিত এবং এর অর্থও স্পষ্ট। ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা আগের নামই বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

সংস্কার কমিশনের ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাবনার সাথে আমরা একমত।

• কমিশন অনুচ্ছেদ ৭ক, ৭খ বিলোপ করার প্রস্তাব করেছে। আমরা মনে করি, সংবিধান কোন অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত বিষয় নয়। জনগণের প্রয়োজনে এর কোন বিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা যেতে পারে। সে প্রেক্ষিত থেকে ৭(ক), ৭(খ) বাতিল করার সাথে একমত।

সংবিধানের মূলনীতি

• কমিশনের মূলনীতি সংক্রান্ত সামগ্রিক আলোচনাটিই (প্রস্তাবনা ও যৌক্তিকতা) আমাদের ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে। এ সম্পর্কিত কমিশনের ব্যাখ্যা ও সুপারিশের প্রত্যেকটা বিষয় পূর্ণ আলোচনার দাবি রাখে। কারণ এর সাথে যুক্ত আছে পাকিস্তানের প্রায় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের দীর্ঘ লড়াই ও এর ধারাবাহিকতায় একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

• কমিশন প্রস্তাব করেছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রকে মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে বাদ দিতে। যে ধারণাগুলিকে কমিশন বাদ দিল এবং যে ধারণাগুলিকে কমিশন অন্তর্ভুক্ত করলো- তার যুক্তিগুলো পরিষ্কার নয়।

• গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- একটি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশ। একটি আধুনিক রাষ্ট্র মানেই ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পাকিস্তানভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সৃষ্টি। ধর্মনিরপেক্ষতা এ লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৯৫০ সালেই মওলানা ভাসানী ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের লেখায় এগুলো বারবার এসেছে। সমাজতন্ত্রের বিষয়টিও তাই। বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তার, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে তার প্রভাব- এসব মিলিয়ে এটিকেও তখন মূলনীতি

• এরপর ২য় পৃষ্ঠা

গণহত্যার বিচার দাবী

গত ১২ মে ২০২৫, গণহত্যার বিচার, আহতদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসন এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার ও নির্বাচনের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)-এর দেশব্যাপী বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পার্টির সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। বক্তব্য রাখেন পার্টি সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য, তসলিমা আক্তার বিউটি ও রাশেদ শাহরিয়ার। রংপুর, গাইবান্ধা, সিলেট, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচী পালিত হয়।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারাও যোগ করা হয়। যেমন সংবিধানের ২০ নং অনুচ্ছেদে, "...প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে তার স্বীয় কর্মানুযায়ী" এই নীতিও গ্রহণ করা হয়, যা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে উল্লেখ করা আছে। যেখানে ঘোষণা দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিপতিদের দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে নীতি হিসেবে 'সমাজতন্ত্র' কিংবা বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধিকার উল্লেখ করা হলেও এর বিশেষ কোন উপযোগিতা নেই- সেটা সে সময়ই ক্রিয়াশীল অনেক বামপন্থী দল বলেছিলেন। এমনকি গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বুর্জোয়া ধারণাগুলোর বাস্তবায়নও তারা ঘটাতে পারে না, সেটাও আমরা শেখ মুজিবের সময় থেকেই দেখেছি। কিন্তু মূলনীতি অধ্যায়ের ১৭টি অনুচ্ছেদের মধ্যে আমরা সে সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চিন্তার ছাপ দেখতে পাব। যদিও এগুলোতে যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য করা হয়নি।

• বাহাত্তরের সংবিধানে যেভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ ও আলোচনার দাবি রাখে। আবার এটাও ঠিক, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে ধারাবাহিক লড়াই, আত্মনিয়ন্ত্রণের সশস্ত্র স্বাধীনতার লড়াই গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঙালী জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার আওয়ামী লীগ এই বাঙালী জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে অন্য জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি দেয়নি। উল্লেখ্য যে, 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির ধারণা ইউরোপীয় নবজাগরণ থেকে আসা। শব্দটি দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বাহাত্তরের সংবিধানে দেশের অন্যান্য জাতিসত্ত্বাকে স্বীকৃতি না দিয়ে জাতীয়তাবাদ বলতে শুধুমাত্র 'বাঙালী জাতি'-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল ভুল। আমরা মনে করি, সংবিধানে বাংলাদেশের সব জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি ও সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

• কিন্তু শুধু গণতন্ত্র রেখে এসবই যখন বাদ দেয়া হয়েছে, সেটা কেন করা হলো- তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আমরা পেলাম না। সমাজতন্ত্র মূলনীতি থেকে বাদ দেয়া সম্পর্কিত আলোচনায় 'সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরোধী'- এই ধরনের মন্তব্যসহ যে ধরনের মূল্যায়ন করা হয়েছে, সেটা ইতিহাসসম্মত নয়, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও নয়। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে মহান লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসবাদের মূলনীতিগুলোকে কার্যকরী করে সর্বহারা শ্রেণি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাষ্ট্রের প্রতি সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের প্রবল আকর্ষণ তৈরি হয়। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা বেকারত্ব দূর করে, নারীকে ব্যাপক স্বাধীনতা দেয়, বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সবগুলো মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। আইনস্টাইন, রমাঁ রল্যাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মওলানা ভাসানীসহ বহু মনীষী এই সভ্যতাকে কুর্নিশ করেছিলেন। একটি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব হতে পারে।

• একই কথা ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রেও খাটে। বলা হচ্ছে, ধর্মনিপেক্ষতা নাকি বিভক্তি সৃষ্টি করে। অথচ ধর্মীয় বিভক্তি ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে একটা রক্ষাকবচ। ধর্মনিরপেক্ষতা সকল ধর্মবিশ্বাসীকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ধর্মনিরপেক্ষতার আসল অর্থ হলো- ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্ম পালনের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার; কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে ধর্ম সংযুক্ত থাকতে পারে না। এটা বহুত্ববাদ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যায়না। আবার বহুত্ববাদ বলতে কমিশন কী বোঝাতে চেয়েছেন- সে ব্যাপারেও আমরা স্পষ্ট হতে পারিনি। ফলে কমিশনের প্রস্তাবনায় "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে"- এই বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশে আমরা বহুত্ববাদী শব্দটি রাখার ব্যাপারে একমত নই।

• মূলনীতি সম্পর্কিত আলোচনার এক অংশে কমিশন মুক্তবাজার অর্থনীতি সুপারিশ করেছেন। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ও দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা মিলে এদেশের মানুষকে কী পরিমাণ শোষণ করেছেন, তা সবার জানা। শেখ হাসিনা গত ১৫ বছর এই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতিকেই কার্যকর করেছিলেন।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

• কমিশন "বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে একটি ভাগ হিসেবে একীভূতকরণ"-এর প্রস্তাব করেছে। সেখানে তারা মূলনীতি অধ্যায়ের ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ১৮(ক), ১৯, ২০, ২৩(ক) এবং ২৪ (যেখানে চারটি মূলনীতির ব্যাখ্যা নয়, অধিকারগুলোর কথা বলা হয়েছে) বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এর বেশিরভাগই বিভিন্ন রূপে কমিশনের প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

• কিন্তু কিছু অধিকার, যা বর্তমান সংবিধানের মূলনীতি অংশে উল্লেখ করা ছিল, তা প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' অধ্যায়ে নেই। সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে বর্তমান সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুসারে অন্যান্যদের সাথে বিধবা ও পঙ্গুরা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিধানটি কমিশন প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' অধ্যায়ের ২৪তম পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বিধবা ও পঙ্গু এতে অন্তর্ভুক্ত নেই। এদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ২৯ নম্বর পয়েন্টে টিকা প্রদানকেও রাষ্ট্রের সামর্থ্যের সাপেক্ষে দেয়া অধিকারের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র সামর্থ্য থাকলে দেবে, না থাকলে নয়। টিকা প্রদান জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। এটা সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

• "সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা"- এই প্রস্তাব করা হয়েছে। এরমধ্যে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, শিশু- এই বিষয়গুলো মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আমরা একমত। কিন্তু উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারগুলো কী এবং কেনই বা তা মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভুক্ত হবে সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। এই সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলোর বিবরণীও অস্পষ্ট।

• "বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন- বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা"- এসকল বিষয়ের সাথে আমরা একমত।

• "প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।"- এই প্রস্তাবনার ব্যাখ্যায় সীমা নির্ধারণের জন্য পরিমাপগুলো ঠিক করা হয়েছে- সেটা যে শাসনক্ষমতায় থাকবে, তার অপব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আমরা প্রতিটি মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক সুরক্ষা ও আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হোক- এটা চাই।

• "যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।"-মৌলিক অধিকারে ক্ষেত্রে সবগুলো জায়গায় সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আবার এই প্রাপ্যতা কতদিনে নিশ্চিত হবে, সেটা সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। মৌলিক অধিকারগুলোর (শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান, কাজ) আইনি বাধ্যবাধকতা ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

আইনসভা

কমিশন দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করেছেন। এর যুক্তি হিসেবে বলছেন-

ক) নির্বাহী কার্যাবলীর দুর্বল তদারকি, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে পূর্বের ধরণের সংসদ যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

খ) নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের কারণে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা এবং সংসদের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে সীমিত হয়েছে।

গ) বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির কারণে জবাবদিহির জায়গাটা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

ঘ) পর্যাপ্ত পর্যালোচনা এবং কার্যকর বিতর্ক ছাড়াই দ্রুত ও দুর্বল আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঙ) সংসদীয় তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণের অভাব শাসক দলকে স্বেচ্ছাচারী আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করেছে।

চ) এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারে নাই।

উচ্চকক্ষের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, সেটির ১০০টি আসন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া আইন উচ্চকক্ষ পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারবে, কিন্তু আটকাতে পারবে না। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উভয়কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে- সেটা উচ্চকক্ষ রাখার পক্ষে একটা ভাল যুক্তি হতে পারে, কিন্তু যেহেতু সংবিধান সংশোধনের জন্য শেষ পর্যন্ত গণভোট প্রয়োজন হবে, ফলে নিম্নকক্ষে কোন দল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে উচ্চকক্ষ না থাকলেও একতরফা সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক চুক্তি দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া দল উচ্চকক্ষে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠই থাকবে। সে কারণে এই কক্ষে বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি ও তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ফলে এটাও কোন কার্যকর ভারসাম্য আনবে না।

উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রীয় খরচ বৃদ্ধি করবে। সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা জানি। এগুলো কমানোর কোন প্রস্তাবনা আমরা কোন কমিশনের রিপোর্টেই পাইনি। যদি নিম্নকক্ষের সাথে কার্যকর ভারসাম্য সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে আমাদের মতো দেশে উচ্চকক্ষ খুব ফলদায়ক কিছু হবে না, নতুন কিছু সুবিধাভোগী তৈরি করা ছাড়া।

কারণ, আমাদের দেশ আয়তনে ছোট। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের মত বহু প্রদেশের বাস্তবতা এখানে নেই। এ ছোট দেশে নিম্নকক্ষে সংসদ সদস্য থেকে ৩০০ থেকে বাড়িয়ে ৪০০ করা ও উচ্চকক্ষে আরও ১০৫ জন সদস্য, সবমিলিয়ে ৫০৫ জন সংসদ সদস্য রাখার প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট করা উচিত। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ হলে পর্যাপ্ত আলোচনা ও বিতর্ক হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সংস্কৃতি চলতে থাকলে দ্বি-কক্ষ হলেও কোন সমাধান আসবে না। রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন না হলে, এককক্ষ বা দ্বিকক্ষে অবস্থার তেমন পরিবর্তন হবে না। বরং এতে জনগণের অর্থব্যয় বৃদ্ধি ও আইন প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা হতে পারে, কিন্তু কার্যকর সংসদ হবে না।

যে সকল উদ্দেশ্যের কথা উচ্চকক্ষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত গঠন ও কাজের এখতিয়ার কমিশনের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে না। আমরা মনে করি, সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থ নিশ্চিত করতে হলে, নিম্নকক্ষের নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। নির্বাচনে কালোটাকা, পেশীশক্তি, ধর্মের ব্যবহার আইন করে বন্ধ করতে হবে। ঋণখেলাপী, কালোটাকার মালিক, দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। জনগণের কাছে সাংসদদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ও সাংসদ হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে ঠিকভাবে পালন করেন, এজন্য 'Right to Recall' অর্থাৎ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ভোটারদের হাতে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার দেওয়া দরকার।

• রাজনৈতিক দলগুলোর মোট আসনের ১০% আসনে তরুণ তরুণীদের মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাবের সাথে আমরা একমত নই। এটা রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের ● এরপর ৩য় পৃষ্ঠা

সাম্যবাদ
১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে ২০২৫

(২য় পৃষ্ঠার পর)

উপর রাখা উচিত। দলগুলোকে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়।

• নির্বাচনে প্রার্থীতার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করার প্রয়োজন নেই, ২৫ বছর রাখাই ভাল।

• আমরা বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পীকার রাখার বিধান, একজন সংসদ সদস্য একই সাথে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান না থাকার বিধান, আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত করা, আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো আইনসভায় আলোচনা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের সাথে একমত। সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলো, সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংবিধানের যেকোন সংশোধনীর খসড়া অনুমোদনের বিধান করা। এরপর তা গণভোটের ফলাফলের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা।

• অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করার ব্যাপারে আমাদের মত হলো ৭০ এর অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাতিল করা। এতে কোন শর্ত রাখা যাবে না।

নির্বাহী বিভাগ

• আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের ভিত্তিতে সরকার গঠন, রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা ও ভারসাম্য আনা- এই প্রস্তাবগুলোর সাথে আমরা একমত।

• কমিশন প্রস্তাবিত ক্ষমতার ব্যাপ্তি ও এখতিয়ার অনুসারে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের অবস্থান সংসদ ও বিচার বিভাগের উপরে অবস্থিত বলেই ধারণা হয়। এই বডির কোন সদস্যকে অপসারন বা এই বডির কোন সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার কোন উপায় এখানে রাখা হয়নি। এ বডি কার কাছে দায়বদ্ধ, তাও বোঝা যায়নি। আমরা মনে করি- সংসদ, বিচার বিভাগ ও শাসন ব্যবস্থা- রাষ্ট্রের এই তিন স্তম্ভের বাইরে নতুন একটি ক্ষমতাসম্পন্ন বডি সৃষ্টি করা উচিত হবে না। এতে রাষ্ট্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। বিভিন্ন দেশে সাংবিধানিক পদসমূহের নিয়োগের জন্য সাংবিধানিক কাউন্সিল বা কমিশন গঠনের উদাহরণ আছে। আমাদের দেশেও সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগের জন্য এরকম কাউন্সিল বা কমিশন গঠন করা যায়। এর বাইরে এর কোন কার্যপরিধি থাকা উচিত নয়। এই সাংবিধানিক কাউন্সিল বা সাংবিধানিক কমিশন সংসদ চলাকালীন সময়েই গঠিত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে কোন সাংবিধানিক কাউন্সিল বা কমিশন গঠন করা যাবে না। এই কমিশনের গঠন কী রূপ হবে তা রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে।

• রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৪ বছর ও রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুইবারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না; রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে, সংসদেই অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে- এইসকল বক্তব্যের সাথে আমরা একমত।

• সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হওয়া, রাষ্ট্রপতির আইনসভা ভেঙে দেয়া, একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করার বিধানের সাথে আমরা একমত।

• প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না- এ ব্যাপারে আমরা একমত।

• অন্তবর্তী সরকার নিয়ে স্প্রেডশিটে উল্লেখিত বিধানসমূহের সাথে আমরা একমত। তবে একে অন্তবর্তী সরকার না বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে

কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার পরিকল্পনা, বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচন, জনগণের ম্যান্ডেটহীন ক্ষমতার ভয়াবহতা ও সীমাহীন দলীয়করণ নিয়ে আলোচনা আছে। এ ছাড়াও সংস্কারের অপরিহার্যতা ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করার পরিকল্পনা প্রতিবেদনের ভূমিকায় আছে। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই যে, শুধুমাত্র গত তিনটি নির্বাচন নয়, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই, অর্থাৎ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রথম নির্বাচন থেকেই প্রতিটি সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তদারকি সরকারের অধীনে যে চারটি নির্বাচন হয়েছে, সেগুলোই আপেক্ষিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রতিবেদনে এ কথার স্বীকৃতি আছে। কিন্তু এত পরিশ্রম করে নির্বাচনব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত এই প্রতিবেদন অনুসন্ধান করতে পারেনি যে, কেন এরকম হলো। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই উপমহাদেশের প্রায় সবকটি দেশেই নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ভোটারদের হুমকি ও জোর-জুলুম, বিপুল পরিমাণে কালো টাকার ব্যবহার- এ সবই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন পার্লামেন্টারি দলগুলির নৈতিক ইচ্ছার কাছে বারবার আবেদন করেও এ ব্যাপারে কোন ফল পাওয়া যায়নি। বাস্তবে বিদ্যমান ব্যবস্থায় জোর করে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক। সমগ্র বিষয়টির কার্যকারণ অনুসন্ধান না করে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ করার সদিচ্ছা কমিশনের থাকতেই পারে, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। ব্যবস্থাটাকে আড়াল করে সত্যের খোঁজ পাওয়া যাবে না। ফলে আমাদের দল মনে করে এই সমগ্র বিষয়টি সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মিলে গভীরভাবে পর্যালোচনা করুক।

প্রতিবেদনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। আমাদের দলের সুনির্দিষ্ট মত হলো বহুদলীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে শুধুমাত্র বড় দলগুলো নয়, ছোট রাজনৈতিক দল ও নতুন রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া উচিত। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক শর্ত করা উচিত নয়।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের স্প্রেডশিটে উত্থাপিত পয়েন্টগুলো নিয়ে মতামত

• রাজনৈতিক ঐকমত্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টীকরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা।

• প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই টার্মে সীমিত করা।

• দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য কর।

• একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা।

• সংসদে বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পীকার পদ দেয়া।

• সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন দেওয়া।

• সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা।

• সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা।

• স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর কর।

• মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে মানবতাবিরোধী (ট্রাইব্যুনাল) আইন ও আরপিও সংশোধন করা।

-উপরের এই বিষয়গুলোর সাথে আমরা একমত।

• জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ও সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন সম্পর্কে আমরা সংবিধান সংস্কার কমিটির প্রস্তাবনা সম্পর্কে মতামত রাখতে গিয়ে বলেছি।

• তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয়। জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করার ব্যাপারেও আমরা একমত নই। সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন এই সময়ে করা অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়।

• তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করার প্রস্তাবে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা অবশ্যই লাগবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালার সংস্কারের ক্ষমতা প্রদান করা যাবেনা, কারণ এটা করবে নির্বাচিত সংসদ।

• স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করার ব্যাপারে আমরা একমত নই। কারণ স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের প্রশ্নে আমরা একমত নই। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে তত্ত্বাবধাযক সরকারপ্রধানের নাম পূর্বের নিয়মেই চূড়ান্ত হতে পারে।

• আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রয়োজন নেই। সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতেই থাকতে পারে।

• 'নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান কর।' এই ব্যাপারে আমরা একমত। তবে আমরা যেহেতু এককক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাব করছি, ফলে সংসদের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান রাখা যায়।

• আমরা মনে করি, নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনকে শর্ত হিসেবে রাখা উচিত নয়। আমরা দীর্ঘদিন থেকে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পূর্বের অগণতান্ত্রিক বিধি ও শর্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছি। ২০০৮ সালের আইন অনুসারে নিবন্ধন পেতে একটি দলকে ২২টি জেলায় কার্যালয় এবং ১০০টি উপজেলা বা থানায় কার্যালয় ও প্রতিটিতে ২০০ জন ভোটারের সমর্থনের প্রমাণ দেখাতে হয়। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ ধরণের শর্ত আরোপ বহুদলীয় গণতন্ত্র, জনগণের রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে সংকুচিত করেছে, যা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার কাজে লাগিয়েছে। একটা বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ততটুকুই, যতটুকু রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি দলকে নথিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রয়োজনে আলোচনার জন্য। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য কিছু নিয়ম মেনে আবেদন করতে হয়, কিন্তু কোথাও বাংলাদেশের মতো একটা দলকে ২০ হাজার সমর্থক, ২২টি জেলায় দলীয় কার্যালয় দেখাতে হয় না। অথচ নিবন্ধনের শর্তে দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে কোন তথ্যপ্রমাণ চাওয়া হয়নি, যেটা ছিল সবচেয়ে জরুরী। আমরা দেখেছি, বিদ্যমান নিবন্ধন আইনকে হাতিয়ার করে বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ সরকার মাঠে ক্রিয়াশীল সরকারবিরোধী বেশ কিছু রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দেয়নি, অন্যদিকে ভোটডাকাতির নির্বাচন করার জন্য সরকারী অর্থে রাতারাতি গড়ে তোলা ভুঁইফোড় অনেক দলকে নিবন্ধন দিয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের পর এই ধরনের আইন বাতিল হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি এর পক্ষে মত দিয়েছেন এবং নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সেটা গ্রহণ করে দল নিবন্ধনের নতুন শর্ত প্রস্তাবও করেছেন। অথচ নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সে নিবন্ধন আইন সংস্কার না করেই, পূর্বের আইনেই নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে- যা নিন্দনীয়।

• নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করার ব্যাপারেও আমরা একমত নই। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে (যদিও এর অনেকগুলো ধারা অগণতান্ত্রিক, যা আমরা বাতিলের দাবি জানিয়েছি) অনেকগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়- আয়ের উৎস, আয়, ব্যয়, দলের অনেক তথ্য প্রকাশ করতে হয়। এর সাথে 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯'-এ রাজনৈতিক দলকে আওতাভুক্ত করা অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন অনুসারে একটি প্রতিষ্ঠানের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটি তথ্য দিতে বাধ্য, যা রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়।

• আইনের ফাঁকফোঁকর কাজে লাগিয়ে ঋণখেলাপী, কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ, অর্থপাচারকারীরা যাতে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না পায়, সেজন্য এ সংক্রান্ত বিধান কঠোর করা ও বাস্তবায়ন করা উচিত।

সাম্যবাদ
১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশকাল: মে ২০২৫

৩ মাসের পাওনা বেতন আদায় করতে তিন মাস ধরে রাস্তায় টিএন্ডজেড গ্রুপের শ্রমিকরা

গত তিন মাস ধরে টিএনজেড গ্রুপের ৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক আন্দোলন করছেন। তাদের ৩ মাসের বকেয়া বেতন, ঈদের বোনাস, সার্ভিস বেনিফিট ও অন্যান্য বকেয়া প্রদান না করে কারখানা বন্ধ করে দেয় মালিকপক্ষ। এই দাবিতে শ্রমিকরা গত ৩ মাস ধরে (রোজার ঈদের আগে থেকে) গাজীপুর এবং ঢাকায় আন্দোলন করে আসছেন। ঈদের আগে রমজানের মাসে গাজীপুরের রাস্তা অবরোধসহ শ্রম ভবনে টানা ৭ দিন তারা অবস্থান কর্মসূচি করেছিল। এই কর্মসূচী চলাকালে শ্রম মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচীতে পুলিশ নির্মম হামলা চালায়। এই হামলায় বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি দিলীপ রায়, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা সীমা দত্তসহ অনেক শ্রমিক আহত হন।

সেই সময়ের ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক-সরকার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পরে সরকারের উদ্যোগে ২৯ মার্চ ২০২৫ তারিখে, ঈদের একদিন আগে, মালিকপক্ষ আনুমানিক ১৭ কোটি পাওনার বিপরীতে ৩ কোটি টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মালিকপক্ষ সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেনি- ৩ কোটি টাকা পরিশোধের ওয়াদা করেও তারা দেয়ার সময় অনুমানিক ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা দিয়েছে। সেই টাকা পেতেও শ্রমিকদের নানারকম বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে। ২৯ মার্চের বৈঠকে শ্রম সচিব ঘোষণা করেছিলেন- মে দিবসের আগে সকল শ্রমিক যেন বকেয়া পায় এবং হাসিমুখে মে দিবস উৎযাপন করতে পারে সেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরকারের এই সকল উদ্যোগের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ২৯ মার্চ শ্রমিকরা তাদের অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করে। ঠিক হয় যে, ঈদের পর ৮ এপ্রিল ২০২৫ শ্রম সচিবের সভাপতিত্বে ত্রি-পক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকে কোন পূর্ব নোটিশ ছাড়াই কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের জানানো হয়। সেই পরিস্থিতিতে যাবতীয় বকেয়া, ঈদ বোনাস, সার্ভিস বেনিফট, নোটিস পে-সহ পাওনাদিও হিসাব ও পরিশোধ এবং মালিকের আস্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাবের জন্য অতিরিক্ত শ্রম সচিবের নেতৃত্বে একটি ত্রি-পক্ষীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির হিসাব অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪ কোটি ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭২১ টাকা। কমিটির সর্বশেষ (২২ এপ্রিল) বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত পাওনাদি ৭ মে ২০২৫ তারিখে পরিশোধের জন্য মালিকপক্ষ চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ তদারক করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

৭ মে সকাল থেকে শ্রমিকরা সকল পাওনা টাকা পাওয়ার ভরসায় অধির আগ্রহে করাখানার সামনে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্ত দিন পার হয়ে গেলেও পাওনা কোন টাকাই তারা পায়নি এবং কমিটির তরফ থেকেও শ্রমিক প্রতিনিধিদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু জানানো হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে তারা বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং পরদিন ৮ মে অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। পূর্বঘোষিত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে যৌথবাহিনী বাঁধা দেয় এবং বর্বরোচিত হামলা চালায়। এতে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ চৌধুরী, শ্রমিক প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, নিখিল দাস, রুবিনা, অর্চনা রানী সামিউল, সাদ্দাম, তোফাজ্জোল হোসেন, আশরাফুল, সীমা আক্তার, জুনায়েদ, মাসুম, সাফিলা বেগমসহ ২০ জনের বেশি আহত হয়।

এই শ্রমিকরা আবার শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। কারখানার বন্ধের কারণে এক মাসের বেশি সময় ধরে তারা বেকার। কাজ করেও তারা তিন মাসের বেতন পাননি, ঈদ হওয়ার এক মাস অতিক্রান্ত হলেও ঈদ বোনাসটাও এখনো পাননি। প্রায় ৫ মাস যাবত কোনরকম আয় ছাড়াই পরিবার নিয়ে অর্থকষ্টে তাদের নির্মম জীবন যাপন করতে হচ্ছে। সন্তাদের শিক্ষাজীবনও ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। কয়েক মাস যাবৎ বাসা ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালারা তাদের নানাভাবে চাপ, অপমান, অপদস্থ করছে। দোকানে অনেক বাকি পড়ায় এখন দোকাদারও বাজার-সদাই দিতে চাচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন কঠিন হয়েছে যে, সাধারণভাবে ডাল-ভাত খেয়ে দিন অতিবাহিত করার ন্যূনতম উপায় নেই। তাদের বক্তব্য হলো, "আমরা তো কোন অনুদান কিংবা ভিক্ষা চাচ্ছি না। শ্রম দিয়েছি, সেই পাওনা আদায়ে কেন এতো বিড়ম্বনা আর প্রতারণার শিকার হতে হচ্ছে? আমরা তো এদেশেরই নাগরিক, সরকার ও রাষ্ট্রের নির্ধারিত বিধি মেনে নিয়েই কারখানায় কাজ করেছি। তাহলে কেন যথাসময়ে আইনানুগ পাওনাদি পাবো না? গত কয়েক মাস ধরেই ন্যায্য পাওনাদির জন্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারে দ্বারে আবেদন জানিয়ে আসছি। তাছাড়া মালিকদের সম্পদ বিক্রি করে পাওনা পরিশোধ করা ও তাদের বিরুদ্ধে রেড এলার্ট জারি করার মতো বিভিন্ন বক্তব্য শ্রম উপদেষ্টার মুখে শুনলেও এর কোন কার্যকরিতা এখানো আমরা দেখিনি।"

টিএন্ডজেড গ্রুপের শ্রমিকরা সরকারের আশ্বাসেই আন্দোলন স্থগিত করেছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।

সংস্কার ও রাষ্ট্র ভাবনায় হরিজন-দলিত জনগোষ্ঠী

গত ১৮ এপ্রিল ২০২৫ জাতীয় প্রেসক্লাবে হরিজন-দলিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ফিলিস্তিন সংহতি সমাবেশ

গত ১৯ এপ্রিল ২০২৫ ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবীতে 'ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি' -এর উদ্যোগে সমাবেশ ও মিছিল।

'চা শ্রমিক ঐক্য'-এর আত্মপ্রকাশ

অজিত রায়কে সভাপতি ও বচন কালোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে চা শ্রমিকদের নতুন সংগঠন 'চা শ্রমিক ঐক্য'-এর ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

অব্যাহত নারীবিদ্বেষী বক্তব্য প্রদানকারী ও নারী অবমাননা, লাঞ্ছনা ও কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়ে গত ৬ মে, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৪ টায় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি সীমা দত্তের সভাপতিত্বে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুস্মিতা রায় সুপ্তি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের অর্থ সম্পাদক নওশিন মুস্তারী সাথী, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমা প্রমুখ।